ই-গভর্ন্যান্স

কোথায় নতুন প্রশাসন কেন্দ্র

আবীর হাসান

লেখার শুরুতেই কমপিউটার জগৎকে ২১ বছর পূর্তির শুভেচ্ছা। আর এ কথা তো না বললেই নয়, বাংলাদেশ কমপিউটার তথা ডিজিটালপ্রযুক্তি যখন কতটা এগুলো তার একটা প্রামাণ্য পরিচিতি পাওয়া যাবে কমপিউটার জগৎ-এর পাতা উল্টালেই। শুধু তাই নয়, প্রযুক্তির বিবর্তন আর আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক-সংস্কৃতি ও মানসিকতার একটি প্রতিচ্ছবিও পাওয়া যাবে কমপিউটার জগতেই। এ কথা বলার কারণ, বাংলাদেশে কমপিউটার ব্যবহার, যোগাযোগের বহুমাত্রিক প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল ডিভাইসভিত্তিক সভ্যতা নির্মাণের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র আর কোথাও নেই, সরকারি বা বেসরকারি আর কোনো পত্রিকা বা সাইট নেই যেখানে ক্রমবিবর্তনের এই তথ্য পাওয়া যাবে। আর কমপিউটার জগৎ শুধু পত্রিকার পাতাতেই সীমাবদ্ধ নেই, এর সহযোগী প্রকল্প www.comjagat.com-এ রয়েছে আরও বিপুল তথ্যভান্ডার। বিভিন্ন সময়ের সরকারি-বেসরকারি পরিকল্পনা ও উদ্যোগ এবং সেসবের চুলচেরা বিশ্লেষণ আমরা দেখতে পাই এই সাইটে।

এবার মূল কথায় আসি। ই-গভর্ন্যান্স বলি, আর ডিজিটাল বাংলাদেশের সরকারি প্রশাসনকে আইসিটিসমৃদ্ধ করার কথাই বলি, তার গতিপ্রকৃতিটা একটু পর্যবেক্ষণের সময় এসেছে বলে মনে করি। বিশেষ করে এই সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, তখন বেশ একটা ডিজিটাল উন্মাদনা সৃষ্টি করেই এসেছিল। কারণ, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেই প্রথমবারের মতো অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার সমার্থক হয়ে উঠেছিল এই ডিজিটাল বাংলাদেশ শব্দ-জোড়। তবে এর সংজ্ঞা ও ব্যাপ্তি নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি আগেও ছিল, এখনও আছে। সোয়া তিন বছর আগের কমপিউটার জগৎ সাক্ষ্য দিচ্ছে, তখনও কিছু অতিউৎসাহ, কিছু উন্মাদনা এবং কিছু তির্যক ব্যাপার ছিল। অনেকেই মনে করেছিলেন আওয়ামী লীগ সরকার 'সবাইকে' কমপিউটার দেয়ার ব্যবস্থা করবে, শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক কমপিউটারায়ন হবে, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড হবে আইসিটিভিত্তিক, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড এবং মানবিক সেবা জনসাধারণ পাবে আইসিটির মাধ্যমে। কমবে দুর্নীতি ও অপচয়। তবে কাজটা যে আলাদিনের চেরাগ ঘষে হবে না, সেটাও কিন্তু ওই ইশতেহারে উলে-খ ছিল, যেটাকে বলা হয় 'রূপকল্প-২০২১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ', যা ঘোলাসা হয়েছিল ২০০৯-১০ অর্থবছরে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায়। তখন তিনি বলেছিলেন : 'আমাদের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২০-২১ সাল নাগাদ আমরা এমন এক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি ও উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। সেই সম্ভাব্য বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থাকবে, আয়-দারিদ্র্য ও মানব-দারিদ্র্য নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে। সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, কমবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং অর্জিত হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলার সক্ষমতা। সেই বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে পরিচিত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে।'

ডিজিটাল বাংলাদেশের মাধ্যমে অর্জনের একটা আউটলাইন পাওয়া গিয়েছিল অর্থমন্ত্রীর ওই বাজেট বক্তৃতায়। কিন্তু অর্থমন্ত্রী পরবর্তীতে আরও দুটি বাজেট বক্তৃতা দিয়েছেন, অথচ ওই ধরনের কথা আর বলেননি তো বটেই, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলোও থেকে যায় অনুলি-খিত। আর কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, আইনি কাঠামো সুনির্দিষ্টকরণ, যোগাযোগ অবকাঠামোগুলোর উন্নয়ন, আইপি টেলিফোনি লাইসেন্স দেয়া, সরকারের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন সেল, কমপিউটার কাউন্সিল ও পিআইডির ডিজিটালাইজেশন- এ কাজগুলোর ব্যাপারেও নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।

তবে ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যা বলেছিলেন, '২০১৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে ও ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এ ছাড়া দেশে ই-টিকেট, ই-টেন্ডারসহ ই-গভর্ন্যান্স চালু হবে।' এ বক্তব্যের কিছু কিছু বাস্তবায়ন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। সীমিত আকারে হলেও রেলের ই-টিকেটিং এবং ই-টেন্ডার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হচ্ছে। ই-বিল এখন অনেকেরই সহজ। শিক্ষা ক্ষেত্রে উলে-খযোগ্য কিছু অগ্রগতি আছে, আছে দোয়েল ল্যাপটপ উৎপাদন শুরুর মতো ইতিবাচক দিকও (যদিও এখন বিষয়টি থমকে আছে)। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু উদ্যোগ চোখে পড়ার মতো, রফতানি বাণিজ্য এবং অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর প্রায় পুরোপুরি ডিজিটালপ্রযুক্তির আওতায়।

কিন্তু তারপরও দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ই-গভর্ন্যান্সকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি প্রাধান্য পায়নি। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, প্রচুর কমপিউটার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে পৌঁছেছে। সচিবালয় থেকে নিয়ে জেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তারা ডেস্কটপ পিসি ছাড়াও ল্যাপটপ ব্যবহার করছেন, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্যালি যোগাযোগ পর্যন্ত তাদের কাজ সীমাবদ্ধ। নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার, ভূমি মন্ত্রণালয়ে কিছু ডিজিটালাইজেশন এবং শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয় তথা ব্যাংকিং খাতে কিছু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনো উদ্যোগ কিন্তু এখন পর্যন্ত চোখে পড়ছে না।

তবে চোখে পড়ছে কিংবা বলা যায় দৃষ্টিকটু মনে হচ্ছে বিষয়টি তা নয়। বিষয়টি হচ্ছে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শব্দ-জোড় থেকে যেনো খুব সন্তর্পণে 'রূপকল্প ২০২১' কথাটিকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে এবং তা সরকারের রাজনৈতিক বিরোধীদের আক্রমণের একটি উপাদান হিসেবে তুলে দেয়া হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ : রূপকল্প ২০২১-এর ফোকাল পয়েন্ট যে কোথায় তা স্পষ্ট পরিষ্কার নয় কিংবা সে ধরনের কিছু করা হয়েছে বলেও শোনা যায়নি। অর্থাৎ সহজভাবে বলা যায়, ডিজিটাল বাংলাদেশের সচিবালয় নেই। বিজ্ঞান থেকে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আলাদা হয়েছে, কিন্তু তার হাতে সেই কাজটা কিভাবে বর্তাচ্ছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। আশ্চর্য ধরনের নীরব পরিকল্পনা কমিশন। অথচ সরকারের এ বিভাগটিরই উচিত ছিল সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী হওয়া কিংবা সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে পরিকল্পনা কমিশনকে ক্ষমতায়ন করা প্রয়োজন ছিল। আইসিটি টাস্কফোর্সও এ বিষয়ে তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

আগেই বলেছি নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার, আর শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি আছে আইসিটি বিষয়ে অর্থাৎ মন্ত্রণালয়টি বাধ্যতামূলক কমপিউটার শিক্ষা চালুর নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ধারণা মেনে নিয়েছে, কিন্তু এর বাস্তব রূপ কেমন হবে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কনটেন্ট ইত্যাদি কিভাবে আধুনিকায়ন হবে তারও কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। এখন পর্যন্ত পরীক্ষার ফল ইন্টারনেটে ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রকাশ, পাঠ্যপুস্তক ইন্টারনেটে ▸

পাওয়ার বিষয়টিই নিশ্চিত হয়েছে।

এরপরও কিন্তু অনেক কিছু থেকে যায়। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক থেকে উচ্চতর পর্যায়ে সিলেবাস আপডেট করা এবং প্রচুর শিক্ষক তৈরির বিষয়টি। এ ছাড়া এ ক্ষেত্রে প্রচুর আইসিটির ব্যবহার জানা কর্মকর্তা প্রয়োজন, যারা কনটেন্ট আপডেট করবেন এবং কর্মোপযোগী জনশক্তি তৈরি করবেন।

সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সম্ভবত ই-গভর্ন্যান্স সম্পর্কিত জনশক্তি। মনে পড়ছে, সেই ১৯৮৩ সালে একজন বেসরকারি উদ্যোক্তা বলেছিলেন শ'দুয়েক যোর প-চ-স ডেস্কটপ কম্পিউটার দিয়ে বাংলাদেশের প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা যায়। তখন ওটাই ছিল অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কম্পিউটার। অর্থাৎ কম্পিউটারের সাথে তখন মাত্র 'পার্সোনাল' শব্দটা যোগ হয়েছে। সেই সময়ও কিছু মানুষ স্বপ্ন দেখতেন কম্পিউটার দিয়ে প্রশাসনের আধুনিকায়নের। সে সময়ও ডাটাবেজ তৈরি এবং তথ্য ব্যবহার করে দ্রুত স্বচ্ছতার সাথে কাজ করার কথা বলতেন অনেকে। বাংলা ভাষায় কম্পিউটার ব্যবহারের চেষ্টাও শুরু হয়েছিল সে সময়ই। এখন কম্পিউটারের কর্মের আওতা বেড়েছে বহুগুণ, কম্পিউটার নিজেই হয়ে উঠেছে যোগাযোগেরও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। এর সাথে মোবাইল ফোনের মেলবন্ধন সব কাজকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে করার তাগিদ সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের নিজেদের মতো করে সরকারি কাজকর্মকে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও মোবাইলনির্ভর করে তোলার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। ভারতসহ উন্নয়নশীল কয়েকটি দেশ প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় সেবায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষ বিভাগ তৈরি করে কাজ শুরু করেছে অনেক আগে থেকেই। সেই নব্বইয়ের দশক থেকেই দেখা গেছে ভারতীয় ফেডারেল গভর্নমেন্ট একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসন কেন্দ্র তৈরি করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজ্য সরকারও শক্তিশালী ডিজিটাল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে দেশি-বিদেশি সহযোগিতায় ডিজিটালাইজেশনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাদের হয়ত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ : রূপকল্প ২০২১'-এর মতো স্লোগান ছিল না, কিন্তু ভিন্ন দূরদর্শিতা নিয়ে কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ডিজিটালাইজেশনের ব্যাপ্তি যখন বেড়েছে, বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে সে সময়ও ওই কেন্দ্রশক্তি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে, তা সে শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারই হোক অথবা ব্যাংকিং খাতে অটোমেশনই হোক।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠার শর্ত যদি আমরা মেনে নেই, তাহলে ওই সমন্বয়হীনতা দূর করতেই হবে এবং প্রশাসনকে ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নিতে হবে। এ উদ্যোগের একটা রূপ হয়ত আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি : একটি মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালী করে তোলা যায়, যার সাথে প্রাথমিকভাবে সমন্বিত থাকবে পরিকল্পনা কমিশন। এখানে দূরদর্শী সরকারি কর্মকর্তা এবং আইসিটি প্রফেশনালদের সমন্বয় ঘটাতে হবে, যারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধির নিরিখে প্রকল্প প্রণয়ন করবেন এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন। একে নতুন প্রশাসনের কেন্দ্রশক্তি বলা যেতে পারে। এখান থেকেই জাতীয় ডাটাবেজ শুরু করে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আইসিটি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। এখান থেকেই লোকবল সরবরাহ করা যেতে পারে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে।

আমাদের দেশে ইতোমধ্যেই কিছু কাজ এগিয়েছে। ব্যাংকিং খাতের কিছু অটোমেশন উল্লেখ করার মতো। বন্দর ব্যবস্থাপনাতেও তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি ঢুকেছে নির্বাচন কমিশনের মতো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানেও। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কাজগুলো হয়েছে তার বিবরণী আগেই দিয়েছি। কিন্তু এসব কাজ এক কেন্দ্র থেকে হয়নি। ব্যাংকিং ক্ষেত্রের কাজগুলো করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অনেকটা বিদেশি চাপেই ডিজিটালাইজেশনের দিকে এগিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজের মতো করে কাজ করছে। ভূমি মন্ত্রণালয় করছে তার নিজের মতো করে। নির্বাচন কমিশন কখনও বুয়েট, কখনও সেনাবাহিনীকে কাজে লাগিয়েছে। অনেকে বলতে পারেন, 'কে কিভাবে করল তা না দেখলেও চলবে- কাজ হচ্ছে কি না সেটাই আসল কথা।' সমস্যা হলো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা উদ্যোগ না থাকায় কাজগুলো সঠিকভাবে হচ্ছে না। চট্টগ্রাম বন্দরে যখন অটোমেশন হয়েছে, তখন মংলা বন্দর বা বেনাপোল স্থলবন্দরে একই ধরনের অটোমেশন হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক যখন রফতানি প্রক্রিয়ার অটোমেশন করল, তখন কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সেটা করল না বা আমদানি শুল্কায়ন প্রক্রিয়ার অটোমেশন করল না। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল ম্যাপিং ও ডাটাবেজের কাজ এগুচ্ছে ধীরগতিতে। আবার ভিওআইপি, থ্রিজি ইত্যাদি নিয়ে বিটিআরসির গড়িমসি শেষ হতেই চাইছে না। এক মন্ত্রণালয়ের সাথে অন্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতাও আছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠার শর্ত যদি আমরা মেনে নেই, তাহলে ওই সমন্বয়হীনতা দূর করতেই হবে এবং প্রশাসনকে ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নিতে হবে। এ উদ্যোগের একটা রূপ হয়ত আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি : একটি মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালী করে তোলা যায়, যার সাথে প্রাথমিকভাবে সমন্বিত থাকবে পরিকল্পনা কমিশন। এখানে দূরদর্শী সরকারি কর্মকর্তা এবং আইসিটি প্রফেশনালদের সমন্বয় ঘটাতে হবে, যারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধির নিরিখে প্রকল্প প্রণয়ন করবেন এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন। একে নতুন প্রশাসনের কেন্দ্রশক্তি বলা যেতে পারে। এখান থেকেই জাতীয় ডাটাবেজ শুরু করে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আইসিটি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। এখান থেকেই লোকবল সরবরাহ করা যেতে পারে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে।

শেষ কথা

প্রশাসনিক এই নতুন কেন্দ্র নিয়ে আবেগ ও কল্পনাপ্রসূত অনেক কথাই বলা যেতে পারে। কিন্তু কাজটা শুরু করলে বাস্তবতার নিরিখে কর্মপদ্ধতি ঠিক করাই হবে উত্তম। আর একটা ধারণা হয়ত অনেকে করছেন, নতুন গঠিত তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কথাই হয়ত আমি বলতে চাচ্ছি! এমনটা কিন্তু নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে হয়ত অর্থ মন্ত্রণালয় কিংবা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ও এ কাজের দায়িত্ব নিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে পেন্টাগনের মতো শক্তিশালী সমর বিভাগ থাকা সত্ত্বেও পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের দেখভাল যদি জ্বালানি মন্ত্রণালয় করতে পারে, তাহলে এ ক্ষেত্রে অন্য ধরনের কিছু হলে সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। এর আরও একটি কারণ প্রচুর অর্থ, দক্ষ জনবল এবং ভার্চুয়াল পণ্য নিয়ে কাজ করতে হবে এ কেন্দ্রটিকে। কাজেই ইতোমধ্যে যারা কিছুটা হলেও যোগ্যতা অর্জন করেছে (যেমন- অর্থ মন্ত্রণালয়) তাদের তত্ত্বাবধানে কাজটি হলে ক্ষতি নেই। এ ছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের সাথে এ মন্ত্রণালয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মোদ্দা কথা, ই-গভর্ন্যান্সের জন্য চাই শক্তিশালী একটি প্রশাসনিক বিভাগ- যারা হার্ডওয়্যার শুধু নয় সফটওয়্যার কেনা ও ব্যবহারের দিকনির্দেশনা দেবে, জনগণকে প্রশাসনের কাছাকাছি নেয়ার কাজটা করবে।

ফিডব্যাক : abir59@gmail.com